দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ১

গণশিক্ষা ঃ বিদ্যমান বাস্তবতা

সাক্ষরতা অভিযান কিংবা গণশিক্ষা অথবা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা- যে নামেই ডাকা হউক না কেন; এ যে এক মহৎ কর্মযোগ, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই। আর এই মহতি কার্যধারাটি আমাদের দেশে শুরু হইয়াছে, সেও আজকের কথা নয়! জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে মুক্তি দিবার লক্ষ্যে উদ্যোগ- আয়োজন চলিয়া আসিতেছে বহুদিন, বহুবর্ষ ধরিয়া। এই কাজে কম করিয়া হইলেও ইতিমধ্যে চলিয়া গিয়াছে আশিটি বৎসর। জানা যায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ১৯১৮ সালে সর্বপ্রথম নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করিয়া তুলিবার প্রয়াস নেওয়া হয়। তারপর থামিয়া থামিয়া এই প্রক্রিয়া চলিয়াছে পাকিস্তান আমলেও। দেশ স্বাধীন হইবার পরও গণশিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রামে-গঞ্জে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া টিপসহির গ্লানি দূর করিবার তৎপরতা দেখা গিয়াছিল। অতএব বলঅ যায়, গণশিক্ষার বিষয়টি কখনই উপেক্ষিত হয় নাই। বিদেশী দাতারা এইখাতে দিয়াছে অঢেল সাহায্য। তাহার ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে।

এক হিসাব হইতে জানা যায় বিগত ২৮ বছরে সাক্ষরতা অভিযান বা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতে ব্যয় হইয়াছে দুই হাজার কোটি টাকা। বাড়িয়াছে গণশিক্ষা কর্মসূচীর পরিধি, এই ক্ষেত্রে যুক্ত হইয়াছে আধুনিক মাত্রা। ১৯৯১ সালে শুরু হয় সমন্বিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাবিস্তার কার্যক্রম। ১৯৯৫ সালে গঠিত হয় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর। এখন ইহাকে শুধু সাক্ষরতা অভিযান বলা হয় না এবং ইহা কেবল বয়স্কদের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। প্রাইমারী শিক্ষাও গণশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। সর্বশ্রেণীর শিশুদের স্কুলে নিয়া যাইবার জন্য কোথাও কোথাও চালু করা হইয়াছে উপবৃত্তি প্রকল্প। শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের লেখাপড়ার জন্যও আছে বিবিধ আয়োজন। মাঝেমধ্যে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলাকে ঘটা করিয়া 'নিরক্ষরমুক্ত' বলিয়া ঘোষণা করিতে শোনা যায়।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কি হইতেছে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্য কার্যত কতখানি বাস্তবায়িত হইতেছে, সে এক বিরাট প্রশ্ন। সম্প্রতি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে দাবী করা হয় যে, গণশিক্ষার নামে ব্যয়িত টাকা পানিতে যাইতেছে। নিরক্ষতা দূরীকরণের কাজ মোটেই আগাইতেছে না। যেসব অঞ্চলকে নিরক্ষরমুক্ত বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইতেছে, তাহাও নাকি তথ্যনির্ভর নয়। অর্থাৎ সেখানেও রহিয়াছে ফাঁকি।

আমরা অবশ্য বিষয়টিকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোন হইতে দেখিবার পক্ষপাতি নই। তবে, এই কথা বোধ হয় অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই যে, গণশিক্ষা খাতে গর্জনের তুলনায় বর্ষণ কমই হইতেছে। স্বীকার্য দেশে সাক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে। ইহা বাড়িয়াছে সময়ের ধারাবাহিকতায় এবং জনস্ফিতির অনুপাতে। ইহার মানে এই নয় যে, দেশের নিরক্ষরের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। গ্রাম ও শহরের দরিদ জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশকে কিন্তু উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা যায় নাই। কেবল প্রকল্প-প্রদর্শন এবং আনুষ্ঠানিকতা করিয়া উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার ঘটান কঠিন বলিয়া মনে করেন অনেকেই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বিষয়টিকে একটি স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিতে না পারিলে কখনই সার্বিক সার্থকতা হাসিল করা যাইবে না। এখন গণশিক্ষা কার্যক্রম চালাইবার জন্য বিভিন্ন এনজিওকে ঠিকা দায়িত্ব দেওয়া হয়। এইক্ষেত্রে অনেক এনজিও ভাল কাজ করিলেও, এমন বহু বেসরকারী সংস্থাও নাকি আছে, টাকা মারিয়া খাওয়াই যাহাদের উদ্দেশ্য। ওইরূপ ভুঁইফোড় এনজিও'র হাতে পড়িয়া গণশিক্ষার কি দুর্গতি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বর্তমানে আমাদের দেশে স্বতস্ফূর্তভাবে সমাজ সেবা কিংবা সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করিবার কোনোই প্রেরণা বিদ্যমান ব্যবস্থায় নাই। একটি গ্রামের কয়েকজন যুবক মিলিয়া যে একটি নৈশবিদ্যালয় চালাইবে, সে প্রেরণা না আছে সরকারের দিক হইতে, না আছে সমাজ হিতৈষী অভিভাবক শ্রেণীর দিক হইতে। ফলে সাক্ষরতার শ্লোগানটি অনেক ক্ষেত্রে হইয়া উঠিয়াছে অসাধু মহলের হাতিয়ার। ঠিকা কাজ চালাইয়া যাইবার মত, দায়সারা ভাবে চলিতেছে গণশিক্ষা বিস্তারের আয়োজন। নিরক্ষর জনগোষ্ঠী এবং এলাকার সাধারণ মানুষের অর্থবহ এবং প্রাণবন্ত সম্পৃক্ততা তৈয়ার হইতেছে না গণশিক্ষা কার্যক্রমের সহিত। অথচ, এই সম্পৃক্ততাটা সবচাইতে বেশী প্রয়োজন, যদি সত্যিকারার্থেই একটি সাক্ষর ও শিক্ষিত জাতি আমরা গড়িয়া তুলিতে চাই। বিষয়টির প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট সকল মহলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।